অকারণের সৃষ্টিসুখ

অঞ্জন চক্রবর্ত্তী

(১)

যে নবিশ সে কেবল দাগা বুলিয়ে চলে। যা গৎ এ বাঁধা আছে সেখানেই শুধু তার বিস্তার। তার বাইরে পা ফেলার সাধ্য নেই তার। কিন্তু যিনি অনুপম শিল্পী তার জন্য ব্যাপ্ত হয়ে ওঠে সারা আকাশ। বাঁধা ছকের আবর্তে মরার ব্রত তাঁর নয়।

ফুরিয়ে আসার বোধ যখন রবীন্দ্রনাথের মাথায় ঢেউ দিচ্ছিল, তখনই যেন নিজেকে ভাব বৈচিত্র্যে আরো ব্যক্ত করেছিলেন, বৈচিত্র্যে উত্তরোত্তর অপরূপ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তাই 'লিপিকা'র আশ্চর্য সংবেদন স্রোতের পর তাঁর হাতের জাদুদন্ডের আরেক চমক 'সে'। আপাত দৃষ্টিতে নিতান্তই ছুটির মেজাজে ছড়িয়ে যাওয়া 'সে' র খামখেয়ালিপনা যার কৌলীণ্যের কোনো দাবি লেখকের নেই:

যেমন তেমন এরা বাঁকা বাঁকা
কিছু ভাষা দিয়ে কিছু তুলি দিয়ে আঁকা,
দিলেম উজাড় করি ঝুলি,
লও যদি তুলি;
রাখো ফেলো যাহা ইচ্ছে তাই
কোনো দায় নাই।

এমনভাবেই তো পৌষ ১৩১৩ এ 'সে' কে হাজির করেছেন তিনি। সেই 'সে' যার নাকি কোনো দাম নেই, নাম নেই, যার কোনো অধিকার নেই, ''বনশ্রী মর্যাদা যারে দেয়নি কখনো।''

স্রষ্টার এই তুচ্ছতার আবরণ গায়ে দিয়ে চলায় আমরা কিন্তু বিভ্রান্ত হই না, 'সে'র পরতে পরতে আমরা উপলব্ধি করি 'হ্যামলেট' নাটকের সেই বিখ্যাত উক্তি – ''It is madness but there is a method in it.'' 'সে' গদ্যে উপস্থাপিত কবিতার হাত ধরে। তাকে ভরিয়ে তুলেছে স্রষ্টার কিছু অত্যাশ্চর্য ছবিও, 'সে' তাই আভরণে 'composite art' । ভাববস্তুতে 'সে' গল্প, গল্প বলার গল্প, গল্পে গল্পে টক্করের গল্প, টক্কর দেওয়া গল্পদের পাশাপাশি রেখে দেবার গল্প।

(২)

নাতনি পুপেকে গল্প বলার ছলে 'সে' র সূচনা। কিন্তু সূচনাতেই এসে পড়ে গল্প সৃষ্টির গল্প। গল্প লেখা মানে মানুষ বানানো। বিধাতার সৃষ্টির পাশাপাশি লেখকের সৃষ্টি। এবংএই কাহিনীর প্রয়োজনে 'সে'র সৃষ্টি আর তার সৃষ্টি কাণ্ডের বর্ণনা ঃ

'অনেক গল্প শুরু হয়েছে এই বলে যে, এক যে ছিল রাজা। আমি আরম্ভ করেছিলুম, এক যে আছে মানুষ। তারপরে লোকে যাকে বলে গপ্‌পো, এতে তারও কোনো আঁচ নেই। সে মানুষ ঘোড়ায় চড়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে গেল না। একদিন রাত্রি দশটার পর এল আমার ঘরে। আমি বই পড়ছিলুম। সে বললে, দাদা খিদে পেয়েছে।'

পিরানদেল্লার 'Six characters in search of an author' নাটকে চরিত্ররা এসেছিলো তাদের জীবনকথার শিল্পে যথাযথ রূপায়ণের দাবি নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের সে শিল্প সৃষ্টির দাবি নিয়ে আসে না, আসে মানবিক সম্পর্কের দাবি নিয়ে। সেই পথেই এসে পড়ে শিল্প। পঞ্চভূতের সভায়

ভূতনাথবাবুর জবানিতে একদিন রবীন্দ্রনাথ জানিয়ে দিয়েছিলেন সে আজকের সাহিত্যের নায়ক রাজা রাজড়া নয়, সাধারণ মানুষ। 'সে' তার প্রথম আবির্ভাবেই বুঝিয়ে দেয় যে তার খিদে পায়। মুড়োর ঘন্ট, লাউচিংড়ি, কাঁটা চচ্চড়ি খায় সে। তার সঙ্গে 'জামাইবাবু'র অনেকটা মেলে। খিদে চরিতার্থ করাই শুধু নয়। সর্বাঙ্গ জলে ভেজা অবস্থায় সে লেখকের ঘরে ঢুকে ভিজে কাপড় ছেড়ে বিছানার চাদর গায়ে জড়িয়ে বসতে চায়।

এতো গেল তার সাধারণ্যের রূপ। কিন্তু পুপে দিদির আনন্দের সংস্থানও করতে হয় তাকে। তাই দাদামশায় ও নাতনির খেলায় এই নামহীন সর্বনামটির গায়ে চেপে বসে নানান সাজ। কখনো কখনো মনে হয় দাদামশায় আর পুপে যেন এক absurd রঙ্গমঞ্চ খুলে বসেছে যার একমাত্র সহ অভিনেতা সে নানান বেশে, নানা সাজে এসে দেখা দেয়। তাই সে বিশেষ হয়ে উঠতে পারে নি।

সে লেখকের সকল 'সে'র জামিন। তার মহত্ত্বের বর্ণনা ঃ 'সেও পয়লা নম্বরের মানুষ, তাই ঠাট্টা মসকরায় ওকে জব্দ করতে পারে না। ওকে বোকার মত সাজাতে আমার মজা লাগে। কেননা ও আমার চেয়ে বুদ্ধিমান। অবুঝের ভান করলেও ওর মানহানি হয় না।'

'সে' কে লেখক নানান সাজে সাজাতে চান, নানান বুলি বলাতে চান। সবসময়ই সে নিছক আজ্ঞাবহ ক্রীতদাসের মতো সবকিছু মুখ বুজে করে নেবে এমন নয়। মাঝে মাঝেই সে স্রষ্টার সঙ্গে তর্কে মেতে ওঠে। লেখক যখন প্রায় 'গ্যালিভার ট্রাভেলস' কাহিনীর উদ্ভট বিজ্ঞান চর্চার burlesque- র ঢঙে হুঁহাউ দ্বীপের গল্প খাড়া করেন, তখন 'সে' স্পষ্ট জানিয়ে দেয় পুপেদিদিকে এমন গল্প হাসাতে পারবে না। ঠিক এমনইভাবে 'beast fable' মাত্রই যে শিশু মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে না এমন কথাও জানিয়ে দিতে ছাড়ে না সে ঃ

'মজা করছ মনে কর। কিন্তু তোমার ঠাট্টা গায়ে ঠেকলে ঝামার মতো লাগে। এর আগে তোমাকে অনেকবার সতর্ক করে দিয়েছি। হাসতে গিয়ে, হাসাতে গিয়ে পরকাল খুইয়ো না। লেজকাটা শেয়ালের কথায় পুপেদিদির চোখ জলে ভরে এসেছিল, দেখতে পাওনি বুঝি? বলতো আজই তাকে আমি একটুখানি হাসিয়ে দিই গে, বিশুদ্ধ হাসি, তাতে বুদ্ধির ভেজাল নেই।'

এই বলে সে নিজেই ফেঁদে বসে এক ছোট্ট নাটিকা। 'গেছোবাবা' কিন্তু 'সে'র জগতে কোনো কিছুই চূড়ান্ত নয়। তাই 'সে' র কণ্ঠেও সংশয়ের সুর ঃ

'যে মানুষ সবই বিনা বিচারে বিশ্বাস করতে পারে, তাকে হাসানো সোজা নয়। ভয় হচ্ছে, পুপেদিদি পাছে 'গেছোবাবা'র সন্ধান করতে পাঠায়।'

'সে'র সঙ্গে লেখকরে সৃষ্টি নিয়ে আরো কিছু দ্বৈরথ দেখতে পাই আমরা। অসম্ভবের গল্প ফাঁদতে লেখক কুলের আঁটির চাটনি কিস্যা ফাঁদেন। সে তার প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, এ যেন আঙুল দিয়ে না লিখে গণেশের শুঁড় দিয়ে লম্বা চালে বাড়িয়ে লেখা। এমনটি তার না পসন্দ। সে ফেঁদে বসে তার নিজের গল্প। লেখক হাঁপিয়ে উঠে থামাতে বললে সে শুনিয়ে দেয় তার মতামতের অভিমুখ ঃ

'বিশ্বাস করবার অতীত যা, তাকেও বিশ্বাস করার যোগ্য করতে পার যদি, তা হলেই অদ্ভুত রসের গল্প জমে। নেহাত বাজার চলতি ছেলে ভোলাবার সস্তা অত্যুক্তি যদি তুমি বানাতে থাকো, তাহলে তোমার অপযশ হবে। এই আমি বলে রাখলুম।' এ যেন লেখকের নিজের উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করা সতর্কবার্তা। তবে 'সে' র রসিক পাঠকমাত্রই স্বীকার করবেন দাদামশায়, সে, পুপের এই অদ্ভুতরঙ্গ 'willing suspenssion of disbelief' তৈরি করতে থাকে পাঠকমানসে যা এই বিচিত্র রচনাকে

জমজমাট করে তোলে। লেখক কিন্তু মস্ত কবিও। তাই এই আঙিনাতে 'সে'র সঙ্গে তার লড়ালড়ি। তিনি লেখেন ঃ

প্রলয়নর্তিনী বন্যা বিনাশের মদিরবিহ্বল
নির্লজ্জ নিষ্ঠুর – এই মত বিশ্ববিপ্লবীর দল
প্রচন্ড সুন্দর। জীবলোকে যে দুর্দান্ত আনে ত্রাস্
হীনতালাঞ্ছনে সে তো পায়না তোমার পরিহাস।

পুপের পছন্দ হয় না। বাঘকে নিয়ে লেখা কবিতায় বঘই তো দেখা যাচ্ছে না। তখন দাদামশায় শোনান 'সে'র লেখা ছড়া, অবশ্যই বাঘ নিয়েঃ

গোঁফ ফুলে ওঠে যেন কাঁটা
বাঘ বলে, গেল কোথা পাঁঠা
বটুরাম বলে নেচে,
এই পেটে তলিয়েছে
খুঁজিলে পাবে না সারা গাঁটা।

পুপের এটাই ভালো লাগে, দাদামশায়ের উত্তর – তা হবে, হয়তো ভালোই লিখেছে। কিন্তু ও ভালো লেখে কি আমি ভালো লিখি সে সম্বন্ধে শেষ অভিমতটা দেবার জন্য অন্তত আরো দশটা বছর অপেক্ষা কোরো। যদিও লেখকের ধারণা 'সে' তাঁর মালটা চুরি করে তার পরে যখন পালিশ করে দেয় ..... এমন ঢের দেখেছি, তবুও ভবিষ্যতের দরবারে বিচার নেবার জন্য দুটোকেই তিনি রাখতে প্রস্তুত। তাঁর বস্তু নিয়েই কোনো কোনো আধুনিক কবি পালিশ করে নতুন বলে চালিয়ে দিচ্ছে, এমন একটা বিষয়ই কি কৌতুকছলে জানিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথ? নাকি এ নিজেরই গোপন মাৎসর্য নিয়ে নিজের রসিকতা?

যাইহোক লেখকের সৃষ্টি আর 'সে'র সৃষ্টির এই দ্বন্দ্ব হয়তো স্রষ্টারই ভাবলোকের ডায়ালেকটিক্স। কিন্তু আঙ্গিকের উপস্থাপনায় লেখক যেন চরিত্রের উপর আধিপত্যর ব্যাপারটাকেই নাড়িয়ে দেন। চরিত্র যেন নিছক আজ্ঞাবহ ক্রীড়নক নয়। তার শুধু আপত্তির সুযোগ নেই। চ্যালেঞ্জেরও জায়গা আছে। শুধু চ্যালেঞ্জ নয়, বিদ্রোহেরও অধিকার পেয়ে যায় 'সে' ঃ আজথেকে আমার গল্প জোগানের কাজে আমি ইস্তফা দিলুম। আমাকে পাতু গেঁজেলের গা পরিয়েছিলে, সেও সহ্য করেছি। শেষকালে বাঁদরের মগজ পুরেছ আমার খুলির মধ্যে, এ সইবে না। এরপরে হয়তো আমাকে চামচিকে কি টিকটিকি কি গুবরে পোকা বানিয়ে দেবে।' মনে মনে ভাবুন। মেটামরফসিসের আশঙ্কায় ক্যাথারসিস। গ্রেগর সামসার পরিণাম পেতে রাজী নয় 'সে'। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথও যেন জানিয়ে দিলেন মানুষকে পোকা বানানোর গল্পে যাবেন না তিনি।

(৩)

পুপে বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে এই গল্পের নাট মঞ্চেরও বদল ঘটে। সর্বনামের বদলে এবার প্রাধান্য ঘটে বিশেষ্যের। তবু ব্যতিক্রম আছে। রাজকুমার নয়, এ সুকুমার। আর তাই রাজকুমারের থেকেও বেশি। একখানা ভাঙা ছাতার মধ্যেই সে খুঁজে পায় পক্ষীরাজ। শুনতে পায় শুক-সারীর গল্প। আকাশের সবচেয়ে অমূল্য ধন 'কিছুই না' দিয়েই সে ছোটাতে চায় পক্ষীরাজ। যখন সে জানতে পারে পুপে দিদির হরণ ওই 'কিছুই না'র তেপান্তরে, তখন সেখান থেকে তাকে ফিরিয়ে নেবার পণ করে সে।

সুকুমারের প্রতি লেখকের পক্ষপাতিত্ব নিয়ে অভিমান পুপে দিদির, হয়তো হিংসেও। কিন্তু এর অন্তরালে যে কোমল এক অনুরাগও রয়েছে তার বিবরণ আমরা পাই পুপেদিদির মুখ থেকেই ঃ 'আমার হিংসুটে স্বভাব ছিল, এইটে মানাবার জন্য তোমার এতই উৎসাহ? আর, আমাদের বিলিতি আমড়া গাছের পাকা আমড়াগুলো পেড়ে নিয়ে সুকুমারদাকে লুকিয়ে দিয়ে আসতুম, আমড়া সে ভালোবাসতো বলে ঃ চুরির অপবাদটা হতো আমার, ভোগ করতো সে।'

কাছের হয়েও স্বপ্নলোকের বাসিন্দা বউঠানের সম্পর্কে অসীম মুগ্ধতার সঙ্গে বালক রবির ঈর্ষাও খানিক ছিল –ও এসে বসেছে আদরের আসনে, আমি যে হেলাফেলার ছেলেমানুষ (ছেলেবেলা)। কিন্তু তাকে অনেকগুণ ছাপিয়ে ছিল শিলাবৃষ্টির মধ্যে আম কুড়িয়ে আনা (কাঁচা আম ঃ আকাশ প্রদীপ)। সুকুমার পুপের গল্পে কি 'যেমন খুশির ব্রজধামে বালগোপালের লীলা' উল্টোভাবে এল?

যাইহোক, এবার 'সে'র বদলে পুপে দিদিই লেখকের গল্পের চালে বাধা দিল। শুনিয়ে দিল গল্পে অনুদ্‌ঘাটিত গল্প। এই কাহিনীতে 'সে' দেখা দেয়। মাথায় তার নাকি দুঃসমস্যার ভিমরুল চাক বেঁধেছে। সে আসে তার ব্যক্ত ছাঁদের গল্প নিয়ে। আসে সুরাসুরের দ্বন্দ্বের গল্প। 'সে'র উপস্থাপনা পুপে দিদিকে অসুরকেই সাব্লাইম ভাবায়। আমাদের মনে পড়ে যায় 'ঘরে বাইরে'র বিমলার কথা, বিমলা পুরুষের মধ্যে 'দুর্দান্ত, ক্রুদ্ধ, এমনকি অন্যায়কারীকে দেখতে ভালোবাসে'। চতুরঙ্গে দামিনী অনবধানে হলেও শচীশের পদাঘাতকে ব্যথার রতনমণি করে রাখে। পাশাপাশি লেখক রাখেন তাঁর নিজের মত ঃ 'অসুর সেই পরিমাণই জোরের ভান করে যে পরিমাণে পুরুষ হয় কাপুরুষ। আজ পৃথিবীতে তারই প্রমাণ পাচ্ছি।' এই ভাবনাই তাঁকে সৌকুমার্য সৃষ্টি করায়। উপস্থাপনায় আনে সুকুমারকে।

এই আখ্যানে আধুনিক বিজ্ঞানের কিরণ এসে পড়ে মাঝে মাঝে। আসে 'wave particle duality'র কথা। আসে আগামী গদ্য কাব্যে লোহার ইলেকট্রনে সোনার ইলেকট্রনে মেশার অনুষঙ্গ যা বিজ্ঞান–সাহিত্যতত্ত্বকে একাকার করে দেয়। টের পাই 'বিশ্বপরিচয়' আসছে। সেই সঙ্গে পৌরাণিক সত্য মিশছে বৈজ্ঞানিক–সত্যয় যে রশ্মি বেগুনীর সীমা পেরিয়ে গেছে, তাকে দেখা যায় না বলেই সে মিথ্যে নয় সেও আলো। ইতিহাসের সেই বেগনী পেরনো আলোতেই মানুষের সত্যযুগের সৃষ্টি। তাকে প্রাগৈতিহাসিক বলব না, সে আল্ট্রা ঐতিহাসিক। কিন্তু সুকুমার যখন সত্যযুগ আর আসবে কিনা জানতে চায় তখন লেখক বলে ওঠেন – ''যতদিন না আসে, ততদিন ছবি আছে, কবিতা আছে, আপনাকে ভুলে গিয়ে আর কিছু হয়ে যাবার ঐ একটা বড় রাস্তা।'' অর্থাৎ উদ্ভটের খেলায় বিজ্ঞানের সঙ্গে পুরাণ, পুরাণের সঙ্গে সাহিত্যকে মিলিয়ে এক আশ্চর্য সুষমা তৈরি করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 'সে' উৎসর্গ করা হয়েছে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে যিনি একধারে বিজ্ঞানী, রবীন্দ্রসাহিত্য প্রকাশনার অন্যতম পুরোধা। রবীন্দ্রনাথ যে লোক সিরিজের কথা ভেবেছিলেন তার প্রথম বই হিসেবে চারুচন্দ্র প্রকাশ করেন বিশ্বপরিচয়। বলাই বাহুল্য, এই উৎসর্গ তাৎপর্যপূর্ণ।

সুকুমার যেন লেখকেরই এক alter ego। তাই সে যখন শালগাছ হয়ে ওঠার ইচ্ছের কথা বলে, তখন তার সেই অসম্ভবের ডানাকে ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব নেন লেখক। ওদিকে লেখক যখন বীরুর মৃত্যুর বর্ণনা দিতে গিয়ে রাত্রিতে বিলীন হবার কথা বলেন, তখন সুকুমার পূজোর ছুটির দিনে আকাশের রোদ্দুরে মিলিয়ে যাবার ইচ্ছা জানায়।

'রবিবার' গল্পে অভীক চিত্রশিল্পী। কোনো কার্যকরী পন্থায় যোগদান তার স্বভাবে জোটেনি। আইনজীবী বাবার সঙ্গে তার বিরোধ। সুকুমারের বাবা তাকে জোর করে আইন পড়াতে চায়। সে চায়

নন্দলাল বাবুর কাছে ছবি আঁকা শিখতে। বলে আমার ছবির খিদে যত, পেটের খিদে তত বেশি নয়। বাবা যখন পেটের খিদে সহজেমিটে যাওয়া নিয়ে কটাক্ষ করে সে হেসে জানায় 'কথাটা সত্য এর প্রমাণ দেওয়া উচিত।'

'খেপা' মাতামহের কাছে টাকা ও পরামর্শ নিয়ে সুকুমার পাড়ি দিলো বিলেতে। বাবাকে জানিয়ে গেল অর্থকারী বিদ্যা শিখতে যাচ্ছি। তার ডায়েরি থেকে জানা গেলো সে উড়ো জাহাজের মাঝিগিরি শিখতে চলেছে। অভীক সার্থক শিল্পী হবার জন্য জাহাজের খালাসী হিসেবে ভেসেছিল বিলেতে। বিভার বাক্স থেকে রত্ন চুরি করে রেখে গেছিলো এক গাদা ছবি। বিভা তার ছবি কোনোদিন তেমন করে বোঝেনি, অন্য মেয়েদের এ বিষয়ে মাতামাতিকে সে অশিক্ষিতের বাড়াবাড়ি হিসেবে নিতো। সুকুমার পুপেদিদির দাদামশায়ের দেখাদেখি ছবি আঁকাতে পুপেদিদি হেসেছিলো। ডায়রি থেকে জানা যায় তারপর থেকে সে একান্তে দশ বছর ছবি আঁকা শিখেছে। দুটি ছবি রেখে গেলো যদি দাদামশায় পুপে দিদিকে দেখিয়ে স্তম্ভিত করতে পারেন, তবেই তার সার্থকতা। কিন্তু 'রবিবার' আর 'সে'র মাঝখানে তফাৎ বিজ্ঞানের সঙ্গে শিল্পকে, সাহিত্যকে মিশিয়ে দেবার খেলায়। অমরবাবু আর অভীকের জগৎ সমান্তরাল। 'সে'র সুকুমার চিত্রশিল্পী, অঙ্কে দক্ষ, হতে চায় মহাকাশ বিজ্ঞানী। তার ইচ্ছে চন্দ্রলোকে পাড়ির, যদি বেঁচে ফেরে তবে পুপে দিদির সঙ্গে পাড়ি দেবে মহাশূন্যে।

'ঐ আকাশটা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ যুগের কোটি কোটি ইচ্ছে দিয়ে পরিপূর্ণ। এই বিলীয়মান ইচ্ছেগুলো বিশ্বসৃষ্টির কোন কাজে লাগে কী জানি। বেড়াক উড়ে আমার দীর্ঘনিশ্বাসে উৎসারিত ইচ্ছেগুলো সেই আকাশেই যে আকাশে আজ আমি উড়তে চলেছি।'

তাসের দেশে রাজপুত্র শুনিয়েছিল ইচ্ছের জয় গাথা। এবার রাজকুমারের বদলে সুকুমারের মুখে আমরা শুনলাম ভিন্ন আঙ্গিকে ইচ্ছের জয়। সুকুমার যে দুটি ছবি রেখে গেছিলো তার মধ্যে একটা ছিল ''জল স্থল আকাশের সঙ্গত।'' ছবির মধ্যে আমরা পেয়ে গেলাম সাংগীতিক ব্যঞ্জনা যে ব্যঞ্জনা অসম্ভবের বেড়া ভেঙে তিন ভুনবকে এক করে দেয়। অন্য ছবিটা তার মতন চেহারার স্বভাবের বরিশালের দাদামশায়ের যা একরকম আত্ম প্রতিকৃতি। নিজেকেই সে যেন ছবিতে অর্পণ করে গেল পুপেকে। ওদিকে সুকুমার ও পুপের অস্ফুট ভালোবাসার গল্প খুব মৃদু আলোয় উৎসারিত হয় 'সে' র কাহিনীতে। সুকুমারের অন্তর্ধানে পুপের প্রতিক্রিয়ায় ফুটে ওঠে সেই মাধুর্যেরই বিভা ঃ

'পুপে দিদি ব্যাকুল হয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল, সুকুমারদার খবর কি। আমি বললুম, সেইটেই পাওয়া যাচ্ছে না বলেই তার বাবা বিলেতে সন্ধান করতে চলেছেন। বিবর্ণ হয়ে গেল দিদির মুখ। আস্তে আস্তে উঠে ঘরে দরজা বন্ধ করে দিল।' দাদামশায়ের একটা সংযোজন আছে এর সঙ্গে। তিনি জানেন পুপে দিদি সুকুমারের আঁকা ছেলেমানুষি আপন ডেস্কে লুকিয়ে রেখেছে।

কোনোদিন বিহারী চক্রবর্ত্তীর মতো লিখতে পারবে না বলে যে বৌঠান তার কিশোর দেওরকে খোঁটা দিতেন তিনি তার নিবেদনকে হয়তো এভাবে রেখে দিতেন সংগোপনে – অন্তরে তার রইলো আমার প্রথম প্রেমের লিখা। বিলেতে আইন পড়তে গেলেও সাহিত্য ও সংগীতের সুধাই বিলেতে পান করেছিলেন রবি যা তার রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠার বা বৌঠানকে তাক লাগানোর প্রস্তুতিতে রেখে গেছে তার দান। রবির দূরে চলে যাওয়ার বন্ধ দরজার ওপারে হয়তো ফুটেছে বৌঠানের নিভৃত বেদনা। তবে রবির বিশ্বকবি হয়ে ওঠা দেখে যাননি বৌঠান। তাই সুকুমারের ছাতে উঠে খুঁজে পাওয়া যায় না সেই ছেলেমানুষির দিনের ভাঙা ছাতা আর আতসবাজির আধপোড়া কাঠি।

'সে'র পুপেদিদির সঙ্গে কথায় কথায় দাদামশায় শুনিয়েছিল একজনের আরেকজন হয়ে ওঠার

গল্প। উদ্ভটের এই স্রোতে ভেসে রবীন্দ্রনাথও তাই যেন চকিতে হয়ে ওঠেন সুকুমার।

'দেখো, অনেকদিন ধরে আমি গম্ভীর পোশাকি সাজপরে এতদিন কাটিয়েছি, সেলাম পেয়েছি অনেক। এখন তোমার দরবারে এসে ছেলেমানুষির ঢিলে কাপড় পরে হাঁপ ছেড়েছি। সময় নষ্ট করার কথা বলছ, দিদি – এক সময় তার হুকুম ছিল না। তখন ছিলুম সময়ের গোলাম। আজ আমি গোলামিতে ইস্তফা দিয়েছি। শেষের কটা দিন আরামে কাটাব। ছেলেমানুষির দোসর পেয়ে লম্বা কেদারায় পা ছড়িয়ে বসেছি। যা খুশি বলে যাব, মাথা চুলকে কারও কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে না।'

এক অনন্য শিল্পী জীবনের শেষপ্রান্তে এসে শিল্পের চূড়ান্ত মুক্তির কথা ঘোষণা করছেন। এখন তার সিদ্ধ হবার বা না হবার কোনো দায় নেই। দাদামশায়ের আরাম কেদারায় পা ছড়িয়ে বসে এখন তিনি তাঁর দ্বিতীয় শৈশব যেন উপভোগ করতে চান নাতনির সঙ্গে। গল্প সল্পর উদ্ভট তাই অনেকটাই নিরুদ্বিগ্ন, নিঃশঙ্ক। ভাবখানা যেন এই আমি দিনের শেষে যদি নাতনিকে গল্প বলতে গিয়ে বলি – দিনরাত তোমার ঐ হিদহিদ্ হিদিক্কারে আমার পাজঞ্জরিতে তিরিতঙ্ক লাগে তখন তার মানে বলতে কোনো পণ্ডিতের কাছে দায়বদ্ধ নই আমি।

'সে'র উদ্ভট কিন্তু এতটা নিরুদ্বিগ্ন ছিল না। তাই উদ্ভটকে খানিকটা ঢাল করেও ধরতে হয় তাঁকে। হ্যাঁ, ইন্দ্রের প্রাঙ্গণতলে দেবতার অর্থহীন খেলার sublimity র বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন না এমন নয়। কিন্তু যখন বলেন 'যেমন–তেমন এরা বাঁকা বাঁকা' বা 'শূন্য মাঠে তুচ্ছ ফুল ফোটে অগোচরে' তখন তাঁর কুন্ঠাও টের পাই আমরা। যাইহোক, বাস্তবে 'সে'র উদ্ভট যে ঢালের থেকে রবীন্দ্রপ্রতিভার তরোয়ালকে বহুগুণ পরিমাণে প্রকাশ করেছে সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। 'সে'র কাঠামোতে স্রষ্টা, পুপে, সে, সুকুমার মিলেমিশে যে আবর্ত তৈরি করেছে 'গল্পসল্প' য় তা পাই না আমরা। বরং সৃষ্টি যেন স্রষ্টার মতোই অনেকটা relaxed। 'সে'র চলার পথে একাধিকবার এসেছে স্রষ্টার crisis of creation। যেমন ঃ

'দাদামশায়, 'সে'র গল্প তুমি থামিয়ে দিলে কেন? বলি তা হলে। কুঁড়েমির স্বর্গ সকল স্বর্গের উপরে। সেখানে ইন্দ্র বসে অমৃত খাচ্ছেন হাজার চক্ষু আধখানা বুজে। তিনি হলেন গল্পের দেবতা। আমি তাঁর ভক্ত, কিন্তু তাঁর সভায় আজকাল ঢুকতেই পারি নে। আমার ভাগে গল্পের প্রসাদ অনেকদিন থেকে বন্ধ। কেন।

পথ ভুল হয়ে গিয়েছিল।

কী করে।

অমরাবতীর যে সুরধুনী নদীর এক পারে ইন্দ্রলোক, তারই ভাঁটিতে আছে আর এক স্বর্গ। কারখানা ঘরের কালো ধোঁয়ার পতাকা উড়ছে সেখানকার আকাশে। সেটা হল কাজের স্বর্গ। সেখানে হাফ প্যান্ট পরা দেবতা বিশ্বকর্মা।'

'সুর ভুলেই যেই ঘুরে বেড়াই কেবল কাজে তোমার চোখের ভর্ৎসনা – হ্যাঁ, জীবনদেবতার এই ভৎর্সনা টের পান রবীন্দ্রনাথ, বোঝেন অপচয়ের স্রোত কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাঁকে।

এরকম আরো একটা উদাহরণে আসা যাক।

'তোমাকে নিয়ে আর কাঁহাতক গল্প বানাই। বয়স হয়ে গেছে, কলমটাকে যেন বাতে ধরল', পুপুদিদির ফরমাশ মতো অসম্ভব গল্প বলার 'হালকা চাল আর নেই কলমের।'

'গল্প বলার হালকা চাল আর নেই কলমের।' এই crisis of creation's র প্রশ্ন 'গল্পসল্প' য় আসে না। যেমন খুশির সাজ এখানে অনেক স্বচ্ছন্দ। 'সে' র পুপে শ্রোতা হিসেবে অনেক বেশি challenging। দাদামশায়ের গল্পকে অসার মনে করে যে তিরস্কারও করে বসতে পারে। 'নন্দিনী' নাম দিয়ে দেওয়া মেয়ের এই দাপট কি স্রষ্টার একান্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত ? 'গল্পগুচ্ছর' গ্রন্থ পরিচয় অংশের তথ্য থেকে জানা যায় 'ইঁদুরের ভোজ' ও 'ওকালতি ব্যবসায়ে ক্রমশই তার' এই রচনা দুটি' বঙ্গলক্ষ্মী পত্রে রবীন্দ্রনাথ পৌত্রী শ্রীমতী নন্দিনী দেবীর নামে প্রকাশ করতে দেন। স্নেহশীল পিতামহর হস্তক্ষেপ এখানে কতটা ছিল তা জানা যায় না তবে নন্দিনীর নামে প্রকাশ করতে দেওয়ার মধ্যে একজন সমান্তরাল স্রষ্টার স্বীকৃতি দেবার বিষয়টি থেকেই যাচ্ছে। 'গল্পসল্প'র নাতনি উৎসাহী শ্রোতা, ভালোলাগা, মন্দ লাগার অভিব্যক্তিও আছে তার। কিন্তু পুপের মত কুসুমিকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলান না – তোমার আবার কলেজ কোথায়? তুমি কি সংস্কৃত জান? যার সামনে দাদামাশায় যেন খানিক ধরা পড়ে কাঁচুমাচু হয়েই বলবেন – দেখো পুপুদিদি, এরকম প্রশ্নগুলি বড়ো রূঢ়। মুখের সামনে জিজ্ঞেস করতে নেই।

'গল্পসল্প' নন্দিতাকে উৎসর্গ করা – 'শেষ পারানির খেয়ায় তুমি দিনশেষের নেয়ে।' গল্প শোনাচ্ছেন নাতনিকে, তবু ভনিতাকে অস্বীকার করতে পারেন না। – 'গম্ভীর হয়ে করি প্রফেটের ভান / শুনে যে ঘুমিয়ে পড়ে সে বুদ্ধিমান' বা – 'বিধাতা পরিয়ে দিলে আজ / নারদমুণির এই সাজ / তাই তো নিয়েছি কাজ উপদেষ্টার। এ কাজটা সবচেয়ে কম চেষ্টার।' সহজসরল গল্পের আড়ালে থেকেই গেছেন একজন প্রফেট যিনি নিরলংকৃত ভাব–ভঙ্গিতেই এনে ফেলেন গভীর বাণী। আবার দিশাও দেখাতে চান, যা, উপদেষ্টার ভূমিকা। 'আসলে এর ভিতরের খবর বড়োদের জন্যই'–একথাও 'আলাপচারি রবীন্দ্রনাথ' বইতে বলতে শোনা যায় যায় তাঁকে। কিন্তু 'গল্পসল্প'র আঙ্গিকের উপরিতল অনেক সহজ সপাট। ছোটো ছোটো যেমন খুশি গপ্‌পোর সঙ্গে ছড়া যা কখনো কখনো বেশ মিলেও যায়।

'গল্পসল্প' র ছোট্ট গল্পগুলির মেজাজে কিন্তু কিছু বৈচিত্রও লক্ষ করার মতো। যেমন গোডার 'বিজ্ঞানী' গল্পটি। নীলমণিবাবু কলম হারান যখন তখন, অথচ কলম হয়তো কানেই গোঁজা। টাকার থলি খুঁজতে ডাকতে হয় ভুতোকে। এমনকি এক বাড়িওয়ালাকে ভাড়া দিতে গিয়ে তিনি দিয়ে বসেন আরেক বাড়িওলাকে। এখানে এক অদ্ভুত মানুষের পরিচয় পাই যিনি চটি হারান কিন্তু চাঁদের গ্রহন লাগতে কেন সিকি সেকেন্ড দেরি তা তিনি বের করে ফেলেন। এই আলুথালু বেখেয়ালী মানুষটি অদ্ভুত হলেও প্রিয়জনের ভালোবাসা এই অদ্ভুতত্বের জন্যই সে অর্জন করে ফেলেছে তা কাহিনীর শেষে জানাতে ভোলেন না। এ কেবল স্নিগ্ধ কৌতুকের গল্প যা সমাজজীবনের কোমল সত্য।

দাদামশায় উপদেষ্টাও, তাই তাঁর কাজ নতুন যুগের গল্প শোনানো। সেই সূত্রেই এসে পড়ে 'বড়ো খবর'। মেহনতী দাঁড় আর শৌখিন পালের দ্বন্দ্বের গল্প। 'পত্রপুট' কাব্যে তাঁর ব্রাত্য মন্ত্রবর্জিত সত্তাকে স্পষ্ট উচ্চারণে ধ্বনিত করেছেন কবি। 'ওরা চিরকাল টানে দাঁড়' তাঁর নিপুণ ইতিহাস পাঠ। ইতিহাসের গতি কোনদিকে এগোচ্ছে, কোনদিকে এগনো উচিত তার এ ইঙ্গিত চলে আসে – ধরা পড়বে দাঁড়েই চালায় নৌকা। ঝড় হোক, ঝাপটা হোক, উজান হোক, ভাঁটা হোক। সেদিন দাদামশায়ের কাজ হবে দাঁড়গুলোর সঙ্গে তাল মেলানো, বুদ্ধিজীবী সেদিন শ্রমজীবীর সঙ্গে রচনা করবে ঐকতান। কিন্তু কুসমিরও একটা কাজ আছে – যেখানে দাঁড় বড়ো বেশি কচকচ্ করে সেখানে দেবে একটু তেল। অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর উত্থান যেখানে অতি উগ্র সেখানে প্রয়োজন একটু পেলবতা, একটু স্নিগ্ধতার স্পর্শের। নইলে গণ্ডগোল।

সারাজীবন ঠেকতে – ঠেকতে, ঠকতে – ঠকতে এগোতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথকে । এই ঠেকা ঠকার বাস্তবতাও তাঁর জীনবকে গড়েপিটে নিয়েছে একরকম করে। এই জগতের আভাসটাই বা ছোটদের বা বড়–ছোটদের কাছে বাদ থাকে কেন? সেই অনুষঙ্গেই এসে গেছে 'ভালোমানুষ' বা 'চণ্ডী'র মতো কাহিনী।

গল্পসল্পের মধ্যে কোথাও কোথাও ফিরে এসেছে 'লিপিকা'র মেজাজ যা আমরা 'সে' তে ঠিক পাই নি। 'রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ' গ্রন্থের লিপিকা পর্বয় তপোব্রত ঘোষ লিখছেন – প্রমথ চৌধুরীকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ 'লিপিকা'র 'ছোট ছোট গল্প' গুলির জন্য বিকল্প দুটি নাম প্রস্তাব করেন। একটি হচ্ছে 'কথিকা', আর একটি হচ্ছে 'গল্পস্বল্প'। লক্ষণীয় রবীন্দ্র প্রস্তাবিত দ্বিতীয় নামটি কিন্তু গল্পসল্প নয়, গল্পস্বল্প। বানানের এই সূক্ষ্ম তারতম্যের মধ্যেই কুসমির সঙ্গে দাদামশায়ের শেষ বয়সের গল্পসল্প এবং লিপিকার স্বল্পাকৃতি গল্পের তফাৎ। অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে সুনিপুণ বিশ্লেষণ। না, 'লিপিকা' এবং'গল্পসল্প' কখনোই এক নয়। কিন্তু এই আপাত নিরীহ শেষবেলার রচনাটি বিচারে যথেষ্ট বিপজ্জনক যেখানে 'বাচস্পতি' গল্পের বাচস্পতি ধ্বনির মাধ্যমেই শব্দার্থে পৌঁছতে চান। 'গল্পসল্প' তাই এখানে গল্প স্বল্প'র সঙ্গে মিশলেও মিশতে পারে।

কৌতুক থাক, আলোচনায় আসি। কোন জায়গা থেকে রবীন্দ্রনাথ 'লিপিকা' লিখতে এলেন? ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের জুলাইয়ে রোটেনস্টাইনকে লিখছেন – In order to forget that life is a night mare, I have to serve these little boys I have gathered round me, teaching them elementary things and telling them stories. উপনিবেশিক অত্যাচার, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের করাল ছায়া স্বাভাবিক ভাবেই বালকমনকে বিষণ্ণ করে তোলে। প্রয়োজন হয় প্রলেপের। 'মেঘলা দিন', 'বাণী', 'মেঘদূত', 'একটি দিন' গল্পগুলিতে এসে পড়ে মেঘ–বৃষ্টির এক আশ্চর্য কোমলতা যা রূঢ় রৌদ্রে ঘোরা প্রাণকে জুড়িয়ে দেয় যেন। এই লেখাগুলিকেই তো জগদীশ ভট্টাচার্য বলবেন গীতিগল্প। গল্পসল্প'র 'পরী' গল্পে আছে সেই মায়াবরণ যেখানে আরো সত্যের কারবারি দাদামশায় নাতনিকে পরী বানিয়ে দেন ঃ

'তুমি দেখবে জ্যোৎস্না স্রোত বেয়ে মেঘের খেয়ানৌকা এসে পৌঁচচ্ছে। কিন্তু, তুমি যে এখন পৃথিবীর পরী হয়েছ, ও নৌকায় তোমার কুলোবে না। এখন তুমি তোমার দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যাবে, কেবল মন থাকবে তোমার সাথি। তোমার সত্য থাকবে এই পৃথিবীতে পড়ে আর তোমার আরও সত্য যাবে কোথায় ভেসে। আমরা কেউ তার নাগাল পাবো না।'

উদ্ভট এখানে সৌন্দর্যে তুলি ডুবিয়ে সৃষ্টি করে চলেছে গানের পাখনা। নির্ভার মন উড়বে তাতেই ভর করে। গল্পের আশ্চর্য গীতসুরভিও গল্পসল্পের ঝুলিতে আছে বৈকি। আবার রূপকথার সোজা টানের অন্তরালে তৈরি হয় রাজরানী গল্প, সন্ন্যাসীবেশে রাজার কাঠকুড়ানিকে রানী নির্বাচন। এ গল্পের সুরভিও লিপিকাকে মনে করায়। লিপিকার আরেকভাগে রয়েছে অনাচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। দুঃস্বপ্নকে তো শুধু মায়াঞ্জনে উড়িয়ে ঢেকে দেওয়া যায় না। তার সৃষ্টি করা ক্ষতকে ভোলাতে চাই, স্নিগ্ধতার শুশ্রূষা। কিন্তু সেই সঙ্গেই প্রয়োজন জীবনের জয়গান, অসুন্দর ও অসত্যকে বর্জন করে জীবনসত্যে পৌঁছানো যেখানে দুঃস্বপ্নের অন্ধকার বিচারবুদ্ধির পথকে গ্রাস করতে পারে না। 'বিদুষক', 'তোতা কাহিনী', 'কর্তার ভূত' এই দিকেই এসে পড়ে। গল্পসল্প'র 'ধ্বংস' এবং'ম্যানেজারবাবু' গল্প দুটিকে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই। 'ধ্বংস' লেখার সময় পৃথিবীর শিশুঘাতী, নারীঘাতী বীভৎসা আরো তীব্র, আরো তীক্ষ্ম হয়ে উঠেছে 'লিপিকা'র সময়ের থেকে। 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে

বিষাক্ত নিঃশ্বাস'। জার্মানির বাপ মেয়ে পিয়ের আর ক্যামিল ছিল বাগান শিল্পী। সৃষ্টি নিয়ে নিরন্তর গবেষণা, শ্রম, ভালোবাসায় কাটতো তাদের দিন। এল যুদ্ধ। বাগানের মালী যেতে বাধ্য হল সেনাবাহিনীতে। গেল মেয়ের বাগদত্ত জ্যাকও। জ্যাক খবর দিতে এল ক্যামিলকে যে তার বাবা সেনানায়ক হয়েছে। সে অবশ্য ক্যামিলকে পেলো না। বাবাকে সে কথা দিয়েছিল বুক দিয়ে বাগান আগলাবে। বহুদুর থেকে আসা গোলায় প্রাণ গিয়েছে তার। প্রকৃতির প্রতিশোধ। মেয়ে ছিল সৃষ্টির জীবনের সঙ্গীনী, সেনানায়কের রক্তক্লান্ত গরিমার কেউ নয় সে।

'ম্যানেজারবাবু' গল্পে এসেছে অত্যাচারী জমিদার কর্মচারীর আদেশ পালন করতে গিয়ে নিষ্ঠাবান পাইকের মৃত্যুর কথা। ম্যানেজার দুধের স্নানের বিলাসে মগ্ন, অন্যদিকে পাইক লুঠেরাদের অস্ত্রে ঘায়েল হয়ে লুটিয়ে পড়লো অসম লড়াইয়ে। তবু ম্যানেজারের কাছে দুধের স্নানই বড় থাকলো, আত্মবলিদানের রক্ত নয়।

চার্লস ল্যাম তাঁর বিখ্যাত রচনা 'Dream children a reverie' তে লিখেছিলেন ছোটরা বড়দের মুখ থেকে বড়দের ছোটবেলার কথা শুনতে চায়। 'গল্পসল্প'র কুস্‌মি দাদামশায়ের কাছ থেকে শুনতে চায় ইরুমাসি, মুন্‌সিজির কথা। ভাগ্নী ইরাবতী বা বাড়ীর মুনসিজির কথা তো জীবনস্মৃতিতে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। ইরাবতীর রাজবাড়ীর গল্প, মুনসিজির বিচিত্র গান বা ইংরেজি লেখার কথা তো সেখানেও আছে,যেমন আছে নাম না উল্লেখ করেও হরিশচন্দ্র হালদারের কথা যে জাদুবিদ্যায় চমৎকৃত করত তাঁকে। তাহলে কি নিছক পুনরাবৃত্তি না করে একটু আপাত বদল যোগ করে আবারো একই জিনিস পরিবেশন করলেন রবীন্দ্রনাথ?

না, গল্পসল্পয় উদ্ভট তাঁকে সত্য থেকে আরো সত্যয় ঢুকে যাবার অগাধ স্বাধীনতা দিয়েছে। realism প্রকৃত বাস্তবকে যেন পুরোপুরি উন্মুক্ত করতে পারে নি, তাই দরকার বাস্তবাতীতের । দাদামশায় কুসমিকে বলেন অবুদ্ধির গুরুত্বের কথা – 'আমার একটা কাঁচামি আছে, আমি সব তাতেই অবাক হয়ে যাই; ইরু এখানেই পেয়ে বসেছিল।' কেমন সে অবুদ্ধির খেলা? তাক লাগার খেলায়?

'ইরু দেখেছে পরীদের ঘরকন্না – সে বেশি দূরে নয়। আমাদের পুকুরের পুব পাড়িতে যে চীনে বট আছে তারই মোটা মোটা শিকড় গুলোর অন্ধকার ফাঁকে ফাঁকে। তাদের ফুল তুলে দিয়ে সে বশ করেছিল। তারা ফুলের মধু ছাড়া আর কিছু খায় না।'

চেনা জগৎ কখন হুশ্ করে ঢুকে গেল মায়া জগতে। 'গল্পসল্প' –এ আরো এক সূক্ষ্ম খেলায় মেতেছেন রবীন্দ্রনাথ – নিজের জীবনের গভীর, গহন, মজা, আপন সত্যকে উদ্ভটের রঙে ইচ্ছে মতন সাজিয়ে দিয়েছেন। এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে 'আরো সত্য' গল্পের সংলগ্ন কবিতায় ঃ–

আমি যখন ছোট ছিলুম, ছিলুম তখন ছোটো;
আমার ছুটির সঙ্গী ছিল ছবি আঁকার পোটো।
বাড়িটা তার ছিল বুঝি শঙ্খী নদীর মোড়ে
নাগকন্যা আসত ঘাটে শাঁখের নৌকা চড়ে।
চাঁপার মতো আঙুল দিয়ে বেণীর বাঁধন খুলে
ঘন কালো চুলের গুচ্ছে কী ঢেউ দিত তুলে।
রৌদ্র আলোয় ঝলক দিয়ে বিন্দু বারির মতো
মাটির পরে পড়ত ঝরে মুক্তা মাণিক কত।

নাগকেশরের তলায় বসে পদ্মফুলের কুঁড়ি
দূরে থেকে দিত তার পায়ের তলায় ছুঁড়ি।

এ গল্প জীবনস্মৃতিতে, ছেলেবেলায় পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে নদীর ধারে চন্দননগরের বাগানবাড়ীর কথা। নৌকায় নদী পারাপারের কথা, বউঠানের সান্নিধ্যে চিরজীবনের সাহিত্যসাধনার পাথেয় সংগ্রহের কথা। চুয়াত্তরেও চন্দননগরে এসে রানীচন্দকে বলবেন কাদম্বরীর মৃত্যুর পর ছাদে পায়চারির কথা – কোথায় তুমি নতুন বউঠান। ['গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ' – রানী চন্দ] । নাগকন্যার পায়ে দূরের থেকে ছুঁড়ে দেওয়া পদ্মের কুঁড়ি তে তাই আভাসিত তাঁর অর্ধস্ফুট কাব্যপ্রতিভার নিবেদন। দেবতাকে অঞ্জলি দূর থেকেই দেওয়া হয়। একটু ঘুরিয়ে ধরলে বলতে হয় অঞ্জলি দেবার সময় দেবতা একটু দূরেই দাঁড়ান। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দাঁড়ান গানের ওপারে।

আমি থাকি মালঞ্চেতে রাজবাগানের মালী
সেইখানেতে যূথীর বনে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালি।
রাজকুমারীর তরে সাজাই কনক চাঁপার ডালা,
বেণীর বাঁধন তরে গাঁথি শ্বেতকরবীর মালা।
মাধবীতে ধরল কুঁড়ি, আর হবে না দেরি–
তুমি যদি এস তবে ফুটবে তোমায় ঘেরি।
উঠবে জেগে রঙনগুচ্ছ পায়ের আসনটিতে,
সামনে তোমার করবে নৃত্য ময়ূর ময়ূরীতে।
বনের পথে সারি সারি রজনীগন্ধায়
বাতাস দেবে আকুল করে ফাগুনি সন্ধ্যায়।

ছোটোবেলার শোনা 'তোমায় বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিলে' গল্পটি শুনে তাঁর ভাবনায় নাড়া লেগেছিল–একদিন সৃষ্টি হয়েছিল 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী।' যাকে সাজিয়ে বিদেশিনী করা হয় সে আসলে চেনা মানুষের অচেনা রূপ। যাকে শারদপ্রাতে, মাধবীরাতে দেখতে পাওয়া যায়, তাকে আবার সিন্ধুপারের বাসিন্দা হিসেবেও ভাবা চলে। জোড়াসাঁকো বাড়ীতে যে রাজকুমারী, চন্দননগরের নদীতে ফুটে ওঠে তার নাগকুমারী রূপ। বর্তমানে আলোচ্য কবিতার মধ্যে গানের ঝলক লক্ষ্য করার মতো। 'বাতাস দেবে আকুল করে ফাগুনি সন্ধ্যায়' মনে করায় 'ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান'। মনে পড়ে মালঞ্চ উপন্যাসে নীরজাকে আদিত্যর স্তুতি ঃ 'সেকালের মেয়েদের পায়ের ছোঁয়া লেগে ফুল ধরতো অশোকে।' নীরজার মধ্যে কাদম্বরী দেখা দিয়েছেন তা আলোচনার চেষ্টা করেছি 'মালঞ্চ' মৃত্যুর ছায়া জীবনের দাবি বইতে। এই কবিতাতেও এসেছে মালঞ্চ তথা বাগান যা কাদম্বরী অনুষঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় liet motif যা 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের 'আবেদন' কবিতাতেও পাই – নিকুঞ্জের অনুচর, আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।

বলতে বলতে মাথার উপর উড়ল হাঁসের দল,
নাগকুমারী মুখের পরে টানল নীলাঞ্চল।
ধীরে ধীরে নদীর পরে নামল নীরব পায়ে,

ছায়া হয়ে গেল কখন চাঁপাগাছের ছায়ে।
সন্ধ্যা মেঘের সোনার আভা মিলিয়ে গেল জলে।
পাতল রাতি তারা-গাঁথা আসন শূন্যতলে।

'কড়ি ও কোমল' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে জগদীশ ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন কিভাবে তার মধ্যে সহাবস্থান করছে কাদম্বরী স্মৃতি এবং মৃণালিনীর সজীব, উষ্ণ সত্তা। এই প্রসঙ্গে আসি 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থর 'উপকথা' কবিতায়

রাজপুত্র অবহেলে কোন দেশে যেত চলে
কত নদী কত সিন্ধু পার।
সরোবর ঘাট আলা, মণি হাতে নাগবালা
বসিয়া বাঁধিত কেশভার
সিন্ধুতীরে কত দূরে কোন রাক্ষসের পুরে
ঘুমাইত রাজার ঝিয়ারি
হাসি তার মণিকণা কেহ তাহা দেখিত না,
মুকুতা ঢালিত অশ্রুবারি।

বর্ষার দিনে স্মৃতিচারণারত কবি নিজের অতীতের ঘটনাকে রূপকথার মতো ভাবছেন। 'ছেলেবেলা'র গঙ্গাতীরে বউঠানের সান্নিধ্যের বর্ষাদিন তাঁর গানের সিন্দুকে তোলা আছে। মাঝে মাঝেই তাকে খুলে দেখা। তাই যৌবনের কাব্যর নাগকন্যা আবারো যেন দেখা দেয় শেষ বয়সের কাব্যকণায়। 'রাজার ঝিয়ারি' আবার ঘুরে আসে 'গল্পসল্প'র 'রাজারানী' গল্পের সংলগ্ন কবিতায় ঃ

আসিল দিয়াড়ি হাতে রাজার ঝিয়ারি,
খিড়কির আঙিনায়, নামটি পিয়ারি।
আমি শুধালেম তারে, এসেছ কী লাগি।
সে কহিল চুপে চুপে, কিছু নাহি মাগি।
আমি চাই ভালো করে চিনে রাখো মোরে,
আমার এ আলোটিতে মন লহো ভরে।
আমি যে তোমার দ্বারে করি আসা - যাওয়া
তাই হেথা বকুলের বনে দেয় হাওয়া।

অনেক দিনের মনের মানুষ এভাবেই বার বার দেখা দেন তাঁকে, ভরিয়ে দেন তাঁকে কাব্য সুরভিতে। আলো দেখান। 'এখন তোমার আপন আলোয় তোমায় চাহিরে'। এখান থেকে আসি 'গল্পসল্প'র চন্দনীতে যেখানে আবারো যেন নিজের জীবনকে ঘেঁটে আরো সত্যয় সাজাতে চেয়েছেন তাকে। অরিজিৎ ছুটেছিল নির্মলকুমারীকে বাঁচাতে, পারেনি। 'নির্মল কুমারী রক্ষা পেল কিন্তু সে মৃত্যুর হাতে, তাঁর হাতে নয় এই দুঃখ'। 'মরণরে তুহুঁ মম শ্যাম সমান' গানটি কাদম্বরীর আত্মনিধনের পর যেন জ্বলন্তভাবে সত্য হয়ে উঠেছে। জ্যোতিদাদার নাটকে লেখা 'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' গানটির অনুষঙ্গ কি এই 'আরো সত্য' লেখার খেলায় ছুঁয়ে গেল রবীন্দ্রনাথকে? একাকার হলো জহরব্রত আর কাদম্বরীর আত্মনিধন?

রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরীকে বাঁচাতে পারেননি। 'তারা-গাঁথা আসন শূন্যতলে'র দিকে আকুল হয়ে তাকিয়ে 'নতুন বৌঠান কোথায় তুমি বলে' বলে পায়চারি করেছেন ছাতে (গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ)। এই সময় তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন মৃণালিনী। পত্রপুটের 'ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত' কবিতায় এই

ভূমিকারই তো আভাস পাই – ফিরে তাকাল আমার কুণ্ঠিত বেদনাকরুণ মুখের দিকে / ত্বরিত পদে এসে বসল আমার পাশে। কখন এসেছে সে? উত্তরটা কবিতায় স্পষ্ট – সঙ্গীহারা আমার বনে প্রিয়ার মধুর রূপে। 'চন্দনী' গল্পে নির্মলকুমারীর মৃত্যুর পর চন্দনীর সঙ্গে বিবাহ হয় অরিজিৎ সিংহর। কাদম্বরীর মৃত্যুর আগেই বিয়ে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু 'আরো সত্য' কি এই নয় যে মৃণালিনী এসেছেন কবির 'সঙ্গীহারা বনে' যা তিনি উল্লেখে রেখেছেন পত্রপুটের নিহিত আত্মজীবীনীমূলক কবিতায়? আবার ফিরি নাগকুমারীর কবিতায়। কবিতার একেবারে শেষ অংশে মাথার উপর হাঁসের দল উড়ে যায়, নাগকুমারী নেমে যায় নীরবে নদীর জলে এবং মিলিয়ে যায়। তবোব্রত ঘোষ 'নিশীথে' এবং'ঘাটের কথা' গল্প দুটিকে মিলিয়েছেন কাদম্বরীর আত্মহত্যার অনুষঙ্গে। নিশীথের গৃহিনী মালিশের ওষুধ খেয়ে নিষ্কৃতি দিয়েছিলে অন্যাসক্ত স্বামীকে, 'ঘাটের কথা'র কুসুম স্বামীর কঠোর অবহেলায় ডুব দিয়েছিল নদীতে। 'নিশীথে' গল্পে আছে মাথার উপর হাঁসের উড়ে যাওয়ার ছবি, 'ঘাটের কথা'য় জলে বিলীন হওয়া। এই দুটি চিত্রকল্পই দেখা দিয়েছে কবিতাটিতে। এছাড়া 'ঘাটের কথা'র কুসুম কে আদর করে মা ডাকতো কুস্‌মি বলে। 'গল্পসল্প'র গল্প শোনা নাতনির নামও কুস্‌মি।

একেবারে শেষের গল্প 'মুক্তকুন্তলা'য় সরাসরি কাদম্বরীর অনুষঙ্গ এল। তাঁর কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে শাড়ী নিয়ে তাঁর সিঁদুর মাথায় পরে রবি সেজেছিল মুক্তকুন্তলা, সেই মুক্তকুন্তলা যে বীরপুরুষের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন ঘোড়ায় চড়ে। রবি কৌতুকচ্ছলে বৌঠানের নাম রেখেছিলেন 'হেকেটি'। হেকেটি কে? the goddess of enchantment and magic, 'a divinity of the underworld'। নদীর নিচে যে মিলিয়ে যায় তার সঙ্গে তো a divinity of the under world'র ছায়া এসেই যায়। হেকেটি আবার 'good for standing by cavalry । বাস্তবের কাদম্বরীকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়তে দেখা গেছে। কবির অন্তরে যিনি কবি তাঁর বাইরের রূপটার সঙ্গেও একাকার হওয়ার ছবি যেন কৌতুকচ্ছলে দেখিয়ে দিলেন কবি। 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র মাছ ধরা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন – আমার এক সহচর আছেন, তাঁহার পুষ্করিনী আছে, কিন্তু ছিপ নাই। অবসর মতো আমি তাঁহার মন হইতে মাছ ধরিয়া থাকি, খ্যাতিটা আমার।' জগদীশ ভট্টাচার্য এই অনুষঙ্গে 'কবি মানসী' – এ 'বিবিধ প্রসঙ্গ'র উৎসর্গপত্রে উল্লিখিত 'আমাদের এই ভাবগুলি'র (আমার নয়) দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নারীর প্রেক্ষিতে তাঁর গান ও কবিতা যেন বৌঠানের শাড়ী পরে লেখা – গল্পসল্প এই 'আরো সত্য'র ছবিটিই যেন ফুটিয়ে তুললো। প্রশ্ন উঠতে পারে এত সকরুণ স্মৃতির আভাস এত লঘুভাবে উপস্থাপিত কেন? প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 'সরোজিনী প্রয়ান' পাঠ যে ভুল তা ধরিয়েছেন জগদীশ ভট্টাচার্য, দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এই রচনার উপেক্ষিত অংশগুলির দিকে ঃ

'এই যে-সব গঙ্গার ছবি আমার মনে উঠিতেছে, এ কি সমস্তই এইবারকার স্টিমার যাত্রার ফল? তাহা নহে। এ-সব কতদিনকার কত ছবি, মনের মধ্যে আঁকা রহিয়াছে। ইহারা বড়ো সুখের ছবি, আজ ইহাদের চারিদিকে অশ্রুজলের স্ফটিক দিয়া বাঁধাইয়া রাখিয়াছি। এমনতরো শোভা আর এ জন্মে দেখিতে পাইব না।' কাদম্বরীর মৃত্যুর একমাস পর সরোজিনী স্টিমারে যেতে নদীতে তাঁর হারিয়ে যাওয়া নাগকন্যার ফেলে যাওয়া অনুষঙ্গ গুলিই যেন খুঁজছিলেন আর তার অশ্রুর উপর চড়িয়েছেন হাসির পর্দার আড়াল ঃ

'জীবনের সিংহাসনের উপর ছবি জড়ানো মছলন্দ পাতিয়া আমাদিগকে পুতুলটির মত সমস্ত দিন কে বসাইয়া রাখিয়াছে, অবশেষে সন্ধ্যাবেলাটিতে মছলন্দখানি তুলিয়া দেয়, দেখা যায় খানকতক চিতার

কাষ্ঠ – এই তো পরিহাস; এইজন্যেই তো এতো বিরাট অট্টহাস্য। আমরাও হাসিতেছি – হাঃ হাঃ হাঃ।'

দাদমশায়ের গল্প বলতে বসে আবার রবীন্দ্রনাথ মুক্তকুন্তলার ট্রাজেডি শুনিয়ে হাসলেন–হাঃ হাঃ হাঃ।

'গল্পসল্প'র আলোচনা শুরু করেছিলাম 'ম্যাজিশিয়ান' গল্প থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে। শেষে আবার ফিরে আসি ওই গল্পের সংলগ্ন কবিতায় ঃ

যেটা যা হয়েই থাকে সেটা তো হবেই–
হয় না যা তাই হলে ম্যাজিক তবেই।
নিয়মের বেড়াটাতে ভেঙে গেলে খুঁটি
জগতর ইস্কুলে তবে পাই ছুটি
অঙ্কর কেলাসেতে অঙ্কই কষি–
সেথায় সংখ্যাগুলো যদি পড়ে খসি,
বোর্ডের পরে যদি হঠাৎ নাম্‌তা
বোকার মতন করে আম্‌তা – আম্‌তা,
দুইয়ে দুইয়ে চার যদি কোন উচ্ছ্বাসে
একেবারে চড়ে বসে ঊনপঞ্চাশে,
ভুল তবু নির্ভুল ম্যাজিক তো সেই ;
পাঁচ সাতে পঁয়ত্রিশ'এ কোনো মজা নেই।
মিথ্যেটা সত্যই আছে কোনোখানে
কবিরা শুনেছি তারি রাস্তাটা জানে–
তাদের ম্যাজিকওলা খ্যাপা পদ্যের
দোকানেতে তাই এত জোটে খদ্দের।

প্লেটোর সনাতন ভ্রুকুটির সামনে দাঁড়িয়ে 'world poet of Bengal' স্বচ্ছ, স্বাভাবিক ভঙ্গীতে জানাচ্ছেন তিনি গোপনবাসী মিথ্যেরই পরশা পাবার প্রয়াসী আর সেই উদ্ভট পথে যাত্রাই কাব্যের ম্যাজিক। 'সে'র গল্পে যে রশ্মি বেগুনী রশ্মি পেরিয়ে গেছে তাকে দেখা যায় না বলেই তাকে সত্য বলা যাবে না, এমন নয়, সে হল আলট্রা–সত্য। দুয়ে দুয়ে চার যখন ঊনপঞ্চাশের উন্মাদনায় চড়ে বসে তখনই ভাঙে সৃষ্টির বাঁধ আর সেই উদ্ভট নিয়েই সৃজনী প্রতিভার নিরন্তর সাধনা।

কৃতজ্ঞতা

কবি মানসী ১ ও ২; জগদীশ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ ঃ তপোব্রত ঘোষ

নাগকন্যা মণিমালার অনুষঙ্গে 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের 'উপকথা' কবিতাটির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষন করেন তপোব্রত ঘোষ। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই।